ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ২য় পত্র: ফিকহুল মুআশারাহ ও মুসলিম পারিবারিক আইন

ক বিভাগ: ফিকহুল মুয়াশারাহ (রচনামূলক প্রশ্ন)

গ্রন্থ পরিচিতি (রদ্দুল মুহতার)

১১. কিতাবটির পূর্ণ নাম কী? এ মহান জ্ঞানগর্ভ কাজটি কোন কোন মতন (মূলগ্রন্থ), শরাহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) এবং হাশিয়া (টীকাগ্রন্থ) দ্বারা গঠিত? (ما هو الاسم الكامل لكتاب رد المحتار على الدر المختار، وما هي كتب المتن والشرح والحاشية التي يتكون منها هذا العمل العلمي الجليل؟)

১২. ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার জ্ঞানগত অবস্থান আলোচনা কর। কেন এ কিতাবটি পরবর্তী ফকীহগণের নিকট হানাফি মাযহাবের ফিকহের ক্ষেত্রে প্রথম ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে গণ্য হয়? (ناقش المكانة العلمية لحاشية ابن عابدين، ولماذا يعتبر هذا الكتاب المرجع الأول والمعتمد في فقه المذهب الحنفي عند المتأخرين؟)

১৩. হাশিয়া রচনার ক্ষেত্রে ইবনে আবিদীনের পদ্ধতি (মানহাজ) ব্যাখ্যা কর। তিনি কীভাবে মাসয়ালাসমূহে নির্ভুলতা যাচাই করেছেন এবং দলীল ও যৌক্তিকতা উল্লেখের মাধ্যমে শক্তিশালী মতগুলো নির্বাচন করেছেন? (اشرح منهج ابن عابدين في الحاشية، وكيف قام بالتدقيق في المسائل واختيار الأقوال الراجحة مع ذكر الأدلة والتعليلات؟)

১৪. কিতাবটি কীভাবে হানাফি মাযহাবের সংকলনে এবং পূর্ববর্তী ফকীহগণের মধ্যকার মতভেদ নিরসনে অবদান রেখেছে, বিশেষকরে পরবর্তী যুগে উদ্ভূত নতুন মাসয়ালাসমূহের ক্ষেত্রে? (كيف ساهم كتاب رد المحتار في تدوين المذهب الحنفي وحسم الخلافات بين العلماء السابقين، خاصة في المسائل المستحدثة التي ظهرت في العصور المتأخرة؟)

১৫. কিতাবটির সেই বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যগুলো কী, যা এটিকে হানাফি মাযহাবে ফাতওয়া প্রদান ও ইজতিহাদের জন্য অপরিহার্য উৎসে পরিণত করেছে? (ما هي المميزات والخصائص التي جعلت رد المحتار مصدرا لا غنى عنه للفتوى والاجتهاد في المذهب الحنفي؟)

১৬. বহুল প্রচলিত সংস্করণগুলোতে হাশিয়াটির বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা কর। কীভাবে 'আদ-দুররুল মুখতার' এবং 'রদ্দুল মুহতার'-এর ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য করা হয়? (تحدث عن تنظيم الحاشية في الطبعات المتداولة، وكيف يتم الفصل بين نص الدر المختار وشرح رد المحتار؟)

১৭. কিতাবটির সাথে তার পূর্ববর্তী হানাফি ফাতওয়ার কিতাবসমূহের সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ইবনে আবিদীন কীভাবে পূর্বসূরিদের প্রচেষ্টা থেকে উপকৃত হয়েছেন? (حلل طبيعة العلاقة بين كتاب رد المحتار وبين كتب الفتاوى الحنفية السابقة له، وضح كيف استفاد ابن عابدين من جهود من سبقه؟)

১৮. কোন কারণগুলোর ফলে এ হাশিয়াটি ছাত্রদের ও ফকীহগণের মাঝে পূর্ণ শিরোনাম উল্লেখ না করে শুধু 'হাশিয়া ইবনে আবিদীন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে? (استعرض الأسباب التي أدت إلى شهرة الحاشية بين طلبة العلم والفقهاء بلقب حاشية ابن عابدين دون ذكر العنوان الكامل)

১৯. এ হাশিয়াটি রচনার ক্ষেত্রে লেখকের লক্ষ্য কী ছিল? 'আদ-দুররুল মুখতার'-এর ব্যাখ্যার ওপর তিনি কী কী অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন? (ما هي أهداف المصنف من كتابة حاشيته هذه، وما هي الإضافات التي قدمها على شرح الدر المختار؟)

২০. তার কিতাবে আলোচিত ফিকহী অধ্যায়সমূহের প্রধান বিভাগগুলো বর্ণনা কর। আলোচনার গভীরতা এবং গবেষণার ব্যাপকতা স্পষ্টকরণসহ। (ناقش الأقسام الرئيسية في تنظيم أبواب الفقه التي تناولها كتاب رد المحتار، مبينا عمق التناول وشمولية البحث)

প্রশ্ন-১১: কিতাবটির পূর্ণ নাম কী? এ মহান জ্ঞানগর্ভ কাজটি কোন কোন মতন (মূলগ্রন্থ), শরাহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) এবং হাশিয়া (টীকাগ্রন্থ) দ্বারা গঠিত?
(ما هو الاسم الكامل لكتاب رد المحتار على الدر المختار، وما هي كتب المتن والشرح والحاشية التي يتكون منها هذا العمل العلمي الجليل؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে কিছু গ্রন্থ এমন রয়েছে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞানের মশাল হিসেবে প্রজ্বলিত। হানাফি মাযহাবের ফিকহী ভাণ্ডারে এমনই এক বিস্ময়কর সংযোজন হলো আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.)-এর কালজয়ী রচনা। এটি কোনো একক গ্রন্থ নয়, বরং এটি তিনটি ভিন্ন স্তরের (মতন, শরাহ ও হাশিয়া) এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। এই কিতাবের গঠনশৈলী এবং এর ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ জানা ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিহার্য।

কিতাবের পূর্ণ নাম (ইসমুল কিতাব আল-কামিল):

জনমুখে কিতাবটি 'ফতোয়া শামী' বা 'শামী' নামে পরিচিত হলেও এর একটি দালিলিক ও পূর্ণাঙ্গ নাম রয়েছে। গ্রন্থকার নিজেই তার এই মহান কাজের নাম রেখেছেন:

(رَدُّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ شَرْحِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ)

উচ্চারণ: রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার শারহি তানভিরিল আবসার।

- **অর্থ:** 'রদ্দুল মুহতার' অর্থ হলো 'বিভ্রান্ত বা পেরেশান ব্যক্তির উত্তর'। অর্থাৎ, ফিকহের জটিল অলিগলিতে পথ হারিয়ে যে ব্যক্তি পেরেশান, এই কিতাব তাকে সঠিক পথের দিশা দেয়। এটি লেখা হয়েছে 'আদ-দুররুল মুখতার'-এর ওপর।

কিতাবের গঠন: মতন, শরাহ ও হাশিয়া:

এই বিশাল জ্ঞানগর্ভ কাজটি মূলত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কিতাবের সমন্বয়ে গঠিত। নিচ থেকে ওপরের দিকে এগুলো স্তরে স্তরে সাজানো। নিচে এর বিবরণ দেওয়া হলো:

১. মতন বা মূলগ্রন্থ (المتن): তানভিরুল আবসার (تنوير الأبصار)

এই কাজের ভিত্তি বা মূল টেক্সট হলো 'তানভিরুল আবসার'।

- **লেখক:** এর রচয়িতা হলেন শায়খ **মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-গাজ্জী আত-তিমুরতাশি** (মৃত্যু: ১০০৪ হিজরি)।
- **বৈশিষ্ট্য:** এটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত। লেখক এখানে হানাফি মাযহাবের শক্তিশালী মতগুলো খুব অল্প কথায় (Ijaz) তুলে ধরেছেন। এটি এতটাই বরকতময় ছিল যে, তৎকালীন সময়ে ছাত্ররা এটি মুখস্ত করত।

২. শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ (الشرح): আদ-দুররুল মুখতার (الدر المختار)

মতনের সংক্ষিপ্ত কথাগুলোকে বুঝিয়ে বলার জন্য যে ব্যাখ্যা লেখা হয়, তাকে শরাহ বলে। 'তানভিরুল আবসার'-এর ওপর লেখা বিশ্ববিখ্যাত শরাহ হলো 'আদ-দুররুল মুখতার'।

- **লেখক:** এর রচয়িতা হলেন আল্লামা **আলাউদ্দিন আল-হাসকাফী** (মৃত্যু: ১০৮৮ হিজরি)। তিনি দামেশকের মুফতি ছিলেন।
- **বৈশিষ্ট্য:** 'দুররুল মুখতার' অর্থ 'নির্বাচিত মুক্তা'। হাসকাফী (রহ.) এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে সাগরের মতো ইলমকে পেয়ালায় ভরেছেন। তিনি অত্যন্ত সংক্ষেপে, অনেকটা ধাঁধার মতো (Enigmatic) ভাষায় এটি লিখেছেন। এতে তথ্যের ঘনত্ব এত বেশি ছিল যে, অনেক সময় সাধারণ পাঠকরা এর অর্থ বুঝতে হিমশিম খেত। এমনকি অনেক জায়গায় ইবারত বা বাক্য অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

৩. হাশিয়া বা টীকাগ্রন্থ (الحاشية): রদ্দুল মুহতার (رد المحتار)

যখন শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যেও অস্পষ্টতা থেকে যায় বা সেখানে কোনো ভুলভ্রান্তি থাকে, তখন সেটা পরিষ্কার করার জন্য যা লেখা হয়, তাকে হাশিয়া বলে। 'আদ-দুররুল মুখতার'-এর অস্পষ্টতা দূর করতে এবং এর ওপর চূড়ান্ত ফায়সালা দিতে ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) এই হাশিয়াটি রচনা করেন।

- **বৈশিষ্ট্য:** এটি কেবল একটি নোট বা টীকা নয়, বরং এটি একটি ফিকহী বিশ্বকোষ। হাসকাফী যেখানে খুব সংক্ষেপে বলেছেন, শামী সেখানে বিস্তারিত দলিল এনেছেন। হাসকাফী যেখানে ভুল করেছেন বা দুর্বল মত

এনেছেন, শামী সেখানে আদবের সাথে তা সংশোধন করেছেন এবং সঠিক মতটি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ছক: কিতাবের গঠন বিন্যাস

স্তর	কিতাবের নাম	রচয়িতা	ভূমিকা
১. মতন (মূল)	তানভিরুল আবসার	ইমাম তিমুরতাশি (রহ.)	মূল মাসআলা সংক্ষেপকরণ
২. শরাহ (ব্যাখ্যা)	আদ-দুররুল মুখতার	ইমাম হাসকাফী (রহ.)	মতনের ব্যাখ্যা ও সংযোজন
৩. হাশিয়া (টীকা)	**রদ্দুল মুহতার**	**ইমাম ইবনে আবিদীন (রহ.)**	চূড়ান্ত তাহকিক ও ফয়সালা

উপসংহার (আল-খাতিমা):

সুতরাং, আমরা যাকে 'ফতোয়া শামী' বলি, তা মূলত তিন প্রজন্মের তিনজন শ্রেষ্ঠ ফকিহ-এর মেধার ফসল। তিমুরতাশি ভিত্তি দিয়েছেন, হাসকাফী দেয়াল গেঁথেছেন, আর ইবনে আবিদীন শামী তাতে ছাদ দিয়ে এবং রং করে সেটাকে পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদে রূপান্তর করেছেন। ফিকহের ছাত্রকে এই চেইন বা সিলসিলা মনে রাখতে হবে।

প্রশ্ন-১২: ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার জ্ঞানগত অবস্থান আলোচনা কর। কেন এ কিতাবটি পরবর্তী ফকীহগণের নিকট হানাফি মাযহাবের ফিকহের ক্ষেত্রে প্রথম ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে গণ্য হয়?

(ناقش المكانة العلمية لحاشية ابن عابدين، ولماذا يعتبر هذا الكتاب المرجع الأول والمعتمد في فقه المذهب الحنفي عند المتأخرين؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

যেকোনো ইলমি কিতাবের মর্যাদা নির্ভর করে তার গ্রহণযোগ্যতা, নির্ভুলতা এবং লেখকের পাণ্ডিত্যের ওপর। হানাফি ফিকহের হাজার হাজার কিতাবের ভিড়ে 'রদ্দুল মুহতার' বা 'হাশিয়া ইবনে আবিদীন' এমন এক অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছে যে, একে মাযহাবের 'ফাইনাল অথরিটি' বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য

করা হয়। পরবর্তী যুগের (মুতাআখখিরিন) ফকিহদের কাছে এটি যেন ফিকহের বাইবেল।

জ্ঞানগত অবস্থান (আল-মাকানাতুল ইলমিয়্যাহ):

ইমাম ইবনে আবিদীনের হাশিয়াটি হানাফি মাযহাবের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় সংযোজন। এর জ্ঞানগত অবস্থান নির্ণয়ে আলেমগণ বলেন:

১. সংশোধনকারী গ্রন্থ: এটি পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর ভুলত্রুটি সংশোধন করেছে। 'দুররুল মুখতার', 'কানজুদ দাকায়েক' বা 'হেদায়া'র কোনো ব্যাখ্যাকার যদি কোনো ভুল করে থাকেন, ইবনে আবিদীন তা শুধরে দিয়েছেন।

২. সিদ্ধান্তকারী গ্রন্থ: যেখানে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে, সেখানে কোনটি 'ফাতওয়ার যোগ্য' (মুফতা বিহি) আর কোনটি বর্জনীয়, তা এই কিতাব নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

৩. বিশ্বকোষীয় মর্যাদা: এটি শুধু ফিকহ নয়, বরং হাদিস, উসুল, তাফসির, ভাষা ও সাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার।

প্রথম ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হওয়ার কারণ:

কেন এই কিতাবটিকে 'মারজাউল আওয়াল' বা প্রথম সোর্স মনে করা হয়? এর পেছনে সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ রয়েছে:

১. দুর্বল ও সবল মতের পার্থক্য (আত-তাময়িজ):

হানাফি মাযহাবে দীর্ঘ সময়ে অনেক দুর্বল (জয়ীফ) মত ঢুকে পড়েছিল। বিচারকরা বিভ্রান্ত হতেন যে, কোন মতের ওপর রায় দেবেন। ইবনে আবিদীন কঠোর পরিশ্রম করে 'জহিরুর রিওয়ায়াহ' (প্রবল মত) এবং 'নাদিরে রিওয়ায়াহ' (বিরল মত)-এর মধ্যে প্রাচীর তুলে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেছেন:

(هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى)

অর্থ: "এটাই মাযহাব এবং এর ওপরই ফাতওয়া হবে।"

২. পূর্ববর্তী সকল কিতাবের নির্যাস (জুবদাতুল কুতুব):

তিনি এই হাশিয়া লেখার সময় সামনে প্রায় সব মৌলিক হানাফি কিতাব খোলা রাখতেন। বাহরুর রায়েক, ফাতহুল কাদির, বাদায়েউস সানায়ে, তাতারখানিয়া, হিন্দিয়া—সব কিতাবের সারমর্ম তিনি এখানে নিয়ে এসেছেন। তাই আলেমরা বলেন, "যার ঘরে শামী (রদ্দুল মুহতার) আছে, তার ঘরে যেন হানাফি মাযহাবের সব কিতাব আছে।"

৩. দুররুল মুখতারের অস্পষ্টতা দূরীকরণ:

মূল কিতাব 'দুররুল মুখতার' অত্যন্ত কঠিন ও সংক্ষিপ্ত ছিল। অনেক জায়গায় ভুল বোঝার অবকাশ ছিল। ইবনে আবিদীন সেই জট খুলে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন হাসকাফী (রহ.) কোথায় ইবারত সংক্ষেপ করতে গিয়ে অর্থের পরিবর্তন করে ফেলেছেন।

৪. নতুন মাসআলার সমাধান (আন-নাওয়াজিল):

তার যুগ পর্যন্ত যেসব নতুন সমস্যা (যেমন—ঘড়ির সময়ের সালাত, নতুন ধরণের ব্যবসায়িক চুক্তি) তৈরি হয়েছিল, সেগুলোর সমাধান তিনি উসুলের ভিত্তিতে দিয়েছেন, যা পূর্বের কিতাবে ছিল না।

৫. উরফের (প্রথার) সঠিক প্রয়োগ:

তিনি দেখিয়েছেন যে, যুগের পরিবর্তনে 'উরফ' বা সামাজিক প্রথার পরিবর্তনের কারণে ফিকহী হুকুম কীভাবে বদলাতে পারে। এটি ফিকহকে জীবন্ত রেখেছে।

ফকিহগণের অভিমত:

ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকিহ আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তার 'বেহেশতি জেওর' লেখার সময় প্রতিটি মাসআলা শামীর সাথে মিলিয়ে নিতেন। আলা হযরত আহমদ রেজা খান (রহ.) তার 'ফাতাওয়া রিজভীয়া'-তে প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় শামীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও হানাফি ফিকহের ক্ষেত্রে এটিই শেষ কথা।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

সারকথা হলো, 'রদ্দুল মুহতার' হানাফি মাযহাবের ফিল্টার বা ছাঁকনি। এই ছাঁকনি দিয়ে যা বের হয়েছে, সেটাই বিশুদ্ধ হানাফি ফিকহ। এ কারণেই পরবর্তী

ফকিহগণ চোখ বন্ধ করে এই কিতাবের ওপর নির্ভর করেন এবং একে ফাতওয়া ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রথম ও অপরিহার্য সূত্র হিসেবে মান্য করেন।

প্রশ্ন-১৩: হাশিয়া রচনার ক্ষেত্রে ইবনে আবিদীনের পদ্ধতি (মানহাজ) ব্যাখ্যা কর। তিনি কীভাবে মাসয়ালাসমূহে নির্ভুলতা যাচাই করেছেন এবং দলীল ও যৌক্তিকতা উল্লেখের মাধ্যমে শক্তিশালী মতগুলো নির্বাচন করেছেন?

اشرح منهج ابن عابدين في الحاشية، وكيف قام بالتدقيق في المسائل (واختيار الأقوال الراجحة مع ذكر الأدلة والتعليلات؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

যেকোনো বড় গবেষণার পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা মেথডলজি (Methodology) থাকে। ইমাম ইবনে আবিদীন তার 'রদ্দুল মুহতার' রচনায় যে পদ্ধতি বা 'মানহাজ' অবলম্বন করেছেন, তা ছিল অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক, নিরপেক্ষ এবং সূক্ষ্ম। তিনি গতানুগতিক ধারায় শুধু পূর্ববর্তীদের লেখা নকল করেননি, বরং একজন দক্ষ বিচারকের মতো প্রতিটি মাসআলার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তার এই অনন্য রচনশৈলীই কিতাবটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

হাশিয়া রচনার পদ্ধতি বা মানহাজ:

ইমাম ইবনে আবিদীন তার হাশিয়া রচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপ ও পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করেছেন:

১. মূল টেক্সটের (মতন ও শরাহ) বিশ্লেষণ:

তিনি প্রথমে 'দুররুল মুখতার'-এর ইবারত বা বাক্যগুলো শব্দে শব্দে বিশ্লেষণ করতেন। হাসকাফী (রহ.) কোনো শব্দ কেন ব্যবহার করেছেন, ব্যাকরণগতভাবে (নাহু-সরফ) তা সঠিক কি না এবং এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে—তা তিনি গভীরভাবে যাচাই করতেন।

- *উদাহরণ:* যদি হাসকাফী কোনো মাসআলা খুব সংক্ষেপে বলে থাকেন, ইবনে আবিদীন তার ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে আসতেন।

২. উদ্ধৃতি বা নকল (Naql) যাচাই:

'দুররুল মুখতার'-এর লেখক অনেক সময় অন্যান্য কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে ভুল করতেন বা অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিতেন। ইবনে আবিদীন মূল সেই সোর্স কিতাব (যেমন—হেদায়া বা খানিয়া) খুলে দেখতেন যে, আসলে সেখানে কী লেখা আছে। যদি দেখতেন যে হাসকাফী ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তবে তিনি বিনয়ের সাথে লিখতেন:

(فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْمَنْقُولَ فِي الْكُتُبِ خِلَافُهُ)

অর্থ: "বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে, কারণ কিতাবসমূহে এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে।"

৩. নির্ভুলতা যাচাই (তাহকিক ও তাদকিক):

মাসআলার বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে তিনি ছিলেন আপসহীন। তিনি দেখতেন:

- মাসআলাটি কি ইমাম আবু হানিফার মূল মত?
- নাকি এটি ইমাম আবু ইউসুফ বা মুহাম্মদের মত?
- পরবর্তী মাশায়েখরা কোন মতের ওপর ফাতওয়া দিয়েছেন?

এই তিনটি ধাপ পার করে তিনি সবচেয়ে নির্ভুল মতটি গ্রহণ করতেন।

৪. দলিল ও যৌক্তিকতা উপস্থাপন (আদ-দালিল ওয়াত-তালিল):

তিনি শুধু হুকুম (Ruling) বলে ক্ষান্ত হতেন না। কেন এই হুকুম দেওয়া হলো, তার পেছনে কুরআনের আয়াত, হাদিস বা কিয়াসের (যুক্তি) দলিল কী—তা উল্লেখ করতেন।

- তিনি হানাফি মাযহাবের উসুলের (মূলনীতি) সাথে মিলিয়ে দেখতেন যে, মাসআলাটি উসুলের সাথে সাংঘর্ষিক কি না।

৫. শক্তিশালী মত নির্বাচন (তারজিহ):

যখন একই বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া যেত, তখন তিনি 'তারজিহ' বা প্রাবল্য দেওয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন:

(وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا) - "ফাতওয়া এর ওপর।"

(وَهُوَ الْأَصَحُّ) - "এটিই অধিক বিশুদ্ধ।"

(وَهُوَ الْمُخْتَارُ) - "এটিই নির্বাচিত।"

এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে তিনি পরবর্তী মুফতিদের জন্য কাজ সহজ করে দিতেন।

৬. আদব ও শিষ্টাচার:

পূর্ববর্তী আলেমদের ভুল ধরার সময় তিনি সর্বোচ্চ আদব রক্ষা করতেন। তিনি সরাসরি কাউকে আক্রমণ করতেন না। বরং বলতেন, "হয়তো লেখকের কলম পিছলে গেছে" বা "হয়তো তিনি অন্য কোনো কিতাবের ওপর নির্ভর করেছেন।"

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীনের রচনার পদ্ধতি ছিল—'নকল' (উদ্ধৃতি) এবং 'আকল' (বুদ্ধিবৃত্তি)-এর এক চমৎকার সমন্বয়। তিনি ছিলেন একাধারে একজন গবেষক, সমালোচক এবং সংস্কারক। তিনি প্রতিটি মাসআলার শিকড় পর্যন্ত পৌঁছেছেন, দলিল দিয়ে সেটিকে মজবুত করেছেন এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে উম্মাহর সামনে পেশ করেছেন। এ কারণেই তার পদ্ধতি বা মানহাজ ফিকহ গবেষণার ক্ষেত্রে এক আদর্শ মডেল।

প্রশ্ন-১৪: কিতাবটি কীভাবে হানাফি মাযহাবের সংকলনে এবং পূর্ববর্তী ফকীহগণের মধ্যকার মতভেদ নিরসনে অবদান রেখেছে, বিশেষকরে পরবর্তী যুগে উদ্ভূত নতুন মাসয়ালাসমূহের ক্ষেত্রে?
كيف ساهم كتاب رد المحتار في تدوين المذهب الحنفي وحسم الخلافات بين العلماء السابقين، خاصة في المسائل المستحدثة التي ظهرت في العصور المتأخرة؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

হানাফি মাযহাবের বিশাল ও বিস্তৃত ফিকহী ভাণ্ডারকে সুশৃঙ্খল ও পরিমার্জিত রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.)-এর 'রদ্দুল মুহতার' এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন মাযহাবের মাসআলাগুলো বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল ও

শক্তিশালী মতের মিশ্রণ ঘটেছিল, তখন এই কিতাবটি 'মুহাক্কিক' বা চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। এটি কেবল একটি টীকাগ্রন্থ নয়, বরং এটি হানাফি মাযহাবের পুনঃসংকলন বা 'তাদবিন'-এর এক অনন্য দলিল।

হানাফি মাযহাবের সংকলনে অবদান (মুসাহারাতু ফি তাদবিনিল মাযহাব):

ইমাম ইবনে আবিদীন তার এই কিতাবের মাধ্যমে হানাফি মাযহাবের বিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলোকে এক সুতোয় গেঁথেছেন।

১. বিক্ষিপ্ত তথ্যের সমাবেশ: হানাফি মাযহাবের ফতোয়াগুলো 'ফাতওয়া কাজিখান', 'খুলাসাতুল ফাতওয়া', 'জহিরিয়া', 'হিন্দিয়া' ইত্যাদি শত শত কিতাবে ছড়ানো ছিল। ইবনে আবিদীন এই সমস্ত কিতাবের নির্যাস বা সারমর্ম 'রদ্দুল মুহতার'-এর মধ্যে নিয়ে এসেছেন। ফলে একজন গবেষক বা মুফতির জন্য আলাদা আলাদা দশটি কিতাব দেখার প্রয়োজন কমে গেছে; শুধু 'শামী' দেখলেই তিনি সব কিতাবের হাওয়ালা পেয়ে যান।

২. নির্ভুল পাঠোদ্ধার: অনেক পুরনো পাণ্ডুলিপিতে লিপিকরের ভুলের কারণে ইবারত বা বাক্য ভুল লেখা ছিল। ইবনে আবিদীন বিভিন্ন نسخ (নুসখা) বা কপি মিলিয়ে সঠিক পাঠটি (Text) সংকলন করেছেন।

পূর্ববর্তী ফকিহগণের মতভেদ নিরসন (হাসমূল খিলাফ):

মাযহাবের অভ্যন্তরে ইমামদের মধ্যে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মুফতিদের জন্য সমস্যা হয় তখন, যখন তারা বুঝতে পারেন না কোন মতের ওপর আমল করতে হবে। ইবনে আবিদীন এই বিভ্রান্তি দূর করেছেন:

১. তারজিহ বা প্রাধান্য দান: যেখানে 'সাহিবাইন' (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) এবং ইমাম আবু হানিফার মধ্যে মতভেদ হয়েছে, সেখানে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, পরবর্তী যুগের আলেমদের (মুতাআখখিরিন) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন মতটি গ্রহণযোগ্য।

২. বিভ্রান্তি দূরীকরণ: অনেক সময় দেখা গেছে, 'দুররুল মুখতার' বা 'কানজুদ দাকায়েক'-এর ব্যাখ্যাকাররা কোনো একটি মাসআলায় ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইবনে আবিদীন দালিলিক প্রমাণের মাধ্যমে সেই ভুল শুধরে দিয়ে প্রকৃত হানাফি মতটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি প্রায়ই বলেন:

(وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الزَّيْلَعِيُّ خِلَافًا لِمَا فِي الدُّرِّ)

অর্থ: "সত্য হলো তা-ই, যা ইমাম জায়লায়ী গ্রহণ করেছেন, দুররুল মুখতারের মতটি সঠিক নয়।"

নতুন মাসআলা বা নাওয়াজিল-এর ক্ষেত্রে অবদান:

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনে নতুন নতুন সমস্যা (New Issues) দেখা দেয়, যেগুলোর সরাসরি সমাধান প্রাচীন কিতাবগুলোতে পাওয়া যায় না। এগুলোকে ফিকহের পরিভাষায় 'নাওয়াজিল' বা 'ওয়াকিয়াত' বলা হয়। ইবনে আবিদীন এই ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছেন:

১. উসুলের প্রয়োগ: তিনি প্রাচীন মাসআলার ওপর 'কিয়াস' (Analogy) করে নতুন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। যেমন—ঘড়ির সময়, নতুন মুদ্রাব্যবস্থা, এবং আধুনিক ব্যবসায়িক চুক্তি।

২. উরফ বা প্রথার ব্যবহার: তার সময়ে প্রচলিত অনেক প্রথা (যেমন—জমির বর্গা চাষ, ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচালনা) নিয়ে তিনি শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে সমাধান দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, যুগ পাল্টালে হুকুম পাল্টাতে পারে, যদি তা 'নস' (কুরআন-সুন্নাহ)-এর বিরোধী না হয়।

আরবি ইবারত:

তার এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আলেমগণ বলেন:

(لَوْلَا ابْنُ عَابِدِينَ لَبَقِيَ الْمَذْهَبُ الْحَنَفِيُّ فِي اضْطِرَابٍ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ)

অর্থ: "যদি ইবনে আবিদীন না হতেন, তবে হানাফি মাযহাবের অনেক মাসআলায় বিশৃঙ্খলা বা অস্থিরতা থেকে যেত।"

উপসংহার (আল-খাতিমা):

'রদ্দুল মুহতার' হানাফি মাযহাবের অগোছালো বাগানকে পরিপাটি করে সাজিয়েছে। এটি পূর্ববর্তী মতভেদগুলোর চূড়ান্ত সমাধান দিয়েছে এবং নতুন যুগের সমস্যার জন্য সমাধানের দুয়ার খুলে দিয়েছে। এ কারণেই হানাফি মাযহাবের সংকলন ও সংরক্ষণে এই কিতাবের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন-১৫: কিতাবটির সেই বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যগুলো কী, যা এটিকে হানাফি মাযহাবে ফাতওয়া প্রদান ও ইজতিহাদের জন্য অপরিহার্য উৎসে পরিণত করেছে? (ما هي المميزات والخصائص التي جعلت رد المحتار مصدرا لا غنى عنه للفتوى والاجتهاد في المذهب الحنفي؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

যেকোনো কিতাব তখনই কালোত্তীর্ণ হয় এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পায়, যখন তার মধ্যে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বা 'খাসায়িস' থাকে। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) রচিত 'রদ্দুল মুহতার' এমন কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা এটিকে হানাফি মাযহাবের অন্য হাজারো কিতাব থেকে আলাদা করেছে। মুফতি ও ফকিহদের জন্য এটি কেবল একটি বই নয়, বরং একটি অপরিহার্য হাতিয়ার।

কিতাবটির বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ (আল-মুমাইয়াজাত ওয়াল খাসায়িস):

এই গ্রন্থটিকে ফাতওয়া ও ইজতিহাদের জন্য অপরিহার্য উৎসে পরিণত করার পেছনে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা (আশ-শুমুলিয়্যাহ):

এটি হানাফি ফিকহের একটি পূর্ণাঙ্গ এনসাইক্লোপিডিয়া। পবিত্রতা (তাহারাত) থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার আইন (ফারাইজ) পর্যন্ত—ইসলামি জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা এখানে আলোচিত হয়নি। তিনি কেবল মাসআলা বলেননি, বরং মাসআলার পটভূমি, কারণ এবং ফলাফলও আলোচনা করেছেন।

২. নির্ভুলতা যাচাই বা তাহকিক (আদ-দিক্কাহ ওয়াত-তাহকিক):

অন্যান্য অনেক কিতাবে দেখা যায়, লেখক পূর্ববর্তী কোনো কিতাব থেকে শুনে শুনে বা না দেখে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ফলে ভুল হয়েছে। কিন্তু ইবনে আবিদীন ছিলেন এক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর। তিনি মূল সোর্স না দেখে উদ্ধৃতি দিতেন না। তিনি যাচাই না করে কোনো দুর্বল মতকে কিতাবে স্থান দেননি। তার তাহকিক এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, তার কলম যেখানে থেমেছে, সেটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে।

৩. মুফতা বিহি কওলের স্পষ্টীকরণ (বয়ানুল মুফতা বিহি):

ফাতওয়া প্রদানের জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো এটি জানা যে, মাযহাবের 'মুফতা বিহি' বা ফাতওয়াযোগ্য মত কোনটি। ইবনে আবিদীন প্রতিটি মতভেদের শেষে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন:

(وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) - "এর ওপরই ফাতওয়া।"

(وَبِهِ يُفْتَى) - "এর দ্বারাই ফাতওয়া দেওয়া হয়।"

এই বৈশিষ্ট্যটি নবীন মুফতিদের জন্য কিতাবটিকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

৪. দলিল ও যুক্তির অবতারণা (ইকামতুদ দালাইল):

তিনি হানাফি মাযহাবের মাসআলাগুলোকে অন্ধভাবে উপস্থাপন করেননি। বরং প্রতিটি মাসআলার পেছনে কুরআন, হাদিস ও আকলি (বুদ্ধিবৃত্তিক) দলিল পেশ করেছেন। এটি মাযহাব বিরোধীদের জবাব দেওয়ার জন্য এবং 'ইজতিহাদ ফিল মাযহাব'-এর জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

৫. ভুল সংশোধন ও পরিমার্জন (আত-তাসহিহ):

তার মূল কিতাব 'দুররুল মুখতার'-এর লেখক আল্লামা হাসকাফী (রহ.) সংক্ষেপ করতে গিয়ে অনেক জায়গায় ইবারত বা বাক্যকে এমনভাবে লিখেছেন যে, অর্থ পাল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ইবনে আবিদীন সেই স্থানগুলোতে দীর্ঘ টীকা লিখে আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কার করেছেন। তিনি বিনয়ের সাথে পূর্বসূরিদের ভুলগুলো সংশোধন করেছেন।

৬. ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সাহিত্যমান:

যদিও এটি একটি জটিল ফিকহী কিতাব, তবুও এর ভাষা অত্যন্ত উচ্চমানের। তিনি কঠিন ফিকহী পরিভাষাগুলোকে সহজ ও প্রাঞ্জল আরবিতে উপস্থাপন করেছেন, যা তার সাহিত্যিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

ইজতিহাদের জন্য অপরিহার্য কেন?

'ইজতিহাদ' হলো নতুন সমস্যার সমাধান বের করা। ইজতিহাদ করার জন্য একজন ফকিহকে অবশ্যই জানতে হবে যে, তার মাযহাবের মূলনীতি (উসুল) কী এবং পূর্ববর্তী ইমামরা কীভাবে চিন্তা করতেন। 'রদ্দুল মুহতার' এই উসুল এবং চিন্তাধারা শেখায়। এটি ফকিহকে মাছ না দিয়ে মাছ ধরা শেখায়। অর্থাৎ, এটি

মুফতিকে এমন যোগ্যতা দান করে, যার মাধ্যমে তিনি পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান নিজেই বের করতে পারেন।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

সারকথা হলো, 'রদ্দুল মুহতার' তার নির্ভুলতা, ব্যাপকতা, দালিলিক ভিত্তি এবং সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতার কারণে হানাফি মাযহাবের মুফতিদের জন্য অক্সিজেনের মতো অপরিহার্য। এই কিতাব ছাড়া হানাফি ফাতওয়া বিভাগ অচল। এটি মাযহাবের রক্ষকবচ এবং গবেষণার অফুরন্ত উৎস।

প্রশ্ন-১৬: বহুল প্রচলিত সংস্করণগুলোতে হাশিয়াটির বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা কর। কীভাবে 'আদ-দুররুল মুখতার' এবং 'রদ্দুল মুহতার'-এর ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য করা হয়?

تحدث عن تنظيم الحاشية في الطبعات المتداولة، وكيف يتم الفصل بين (نص الدر المختار وشرح رد المحتار؟

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.)-এর 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবটি একটি জটিল কাঠামোর ওপর বিন্যস্ত। যেহেতু এটি একটি 'হাশিয়া' বা টীকাগ্রন্থ, তাই এটি একা প্রকাশিত হয় না; বরং এর সাথে মূলগ্রন্থ 'আদ-দুররুল মুখতার' এবং অনেক ক্ষেত্রে 'তানভিরুল আবসার'ও সংযুক্ত থাকে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই কিতাবের ছাপানো বিন্যাস (Layout) এবং পড়ার নিয়ম জানা অত্যন্ত জরুরি। নতুবা কোনটা মূল লেখকের কথা আর কোনটা ব্যাখ্যাকারীর কথা—তা গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে।

প্রচলিত সংস্করণগুলোতে হাশিয়ার বিন্যাস (তানজিমুল হাশিয়া):

যুগে যুগে 'রদ্দুল মুহতার'-এর অনেক সংস্করণ বা এডিশন বের হয়েছে। যেমন—মিশরের বুলাক সংস্করণ, পাকিস্তানের এইচ. এম. সাঈদ সংস্করণ এবং লেবাননের দারুল ফিকর সংস্করণ। তবে প্রায় সব ধ্রুপদী সংস্করণে পৃষ্ঠার বিন্যাস বা সাজসজ্জা মোটামুটি একই রকম থাকে। এটি সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত থাকে:

১. উপরের অংশ (আলা আস-সাফহা):

পৃষ্ঠার ওপরের অংশে থাকে মূল কিতাব 'আদ-দুররুল মুখতার'। এটি সাধারণত একটু বড় ফন্টে এবং মোটা কালিতে লেখা থাকে। মাঝে মাঝে এর ভেতরে ব্র্যাকেটের মধ্যে 'তানভিরুল আবসার'-এর মূল মতনটুকু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। একে বলা হয় 'মতন ও শরাহ'-এর অংশ।

২. নিচের অংশ বা পার্শ্বদেশ (আসফালুস সাফহা):

পৃষ্ঠার নিচের অংশে বা চারপাশের বর্ডারে থাকে 'রদ্দুল মুহতার' বা ইবনে আবিদীনের হাশিয়া। এটি সাধারণত মূল লেখার চেয়ে একটু ছোট ফন্টে থাকে। একটি চিকন দাগ বা বর্ডার দিয়ে ওপরের মূল কিতাব এবং নিচের হাশিয়াকে আলাদা করা হয়।

পার্থক্য করার পদ্ধতি (কায়ফিয়াতুল ফাসল):

পাঠক কীভাবে বুঝবেন যে তিনি এখন কার কথা পড়ছেন? এই পার্থক্য করার জন্য প্রকাশকরা এবং লেখক নিজে কিছু নির্দিষ্ট চিহ্ন বা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন:

- **ব্র্যাকেট বা বন্ধনী (আল-আকওয়াস):** মূল কিতাব 'দুররুল মুখতার'-এর যে শব্দ বা বাক্যটির ব্যাখ্যা ইবনে আবিদীন দিতে চান, সেই শব্দটি হাশিয়ার শুরুতে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে দেন। এরপর **(قوله: كذا)** অর্থাৎ 'তার (মূল লেখকের) কথা: অমুক'—এই বলে তিনি আলোচনা শুরু করেন।

- **নম্বর বা ফুটনোট:** আধুনিক ছাপাগুলোতে (যেমন—দারুল ফিকর বা জাকারিয়া বুক ডিপো) ওপরের মূল কিতাবের লাইনে ছোট করে ১, ২, ৩ নম্বর দেওয়া থাকে এবং নিচে সেই নম্বরের আন্ডারে ইবনে আবিদীনের আলোচনা থাকে। এটি পড়া সহজ।

- **ভাষা ও সম্বোধন:** ইবনে আবিদীন যখন মূল লেখকের কোনো কথার ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি বলেন **(أَيْ)** অর্থাৎ 'মানে হলো'। আর যখন তিনি মূল লেখকের ভুল ধরেন বা দ্বিমত করেন, তখন বলেন **(قُلْتُ)** অর্থাৎ 'আমি বলি' অথবা **(فِيهِ نَظَرٌ)** অর্থাৎ 'এতে আপত্তি আছে'।

পড়ার নিয়ম:

কিতাবটি পড়ার সময় একজন ছাত্রকে প্রথমে ওপরের মূল ইবারত (দুররুল মুখতার) পড়তে হয়। যখনই তিনি কোনো জটিল শব্দ বা বাক্যের সামনে আসেন, তখন তিনি চোখ নামিয়ে নিচে বা পাশে হাশিয়াতে (রদ্দুল মুহতার) দেখেন যে, ইবনে আবিদীন এ বিষয়ে কী বলেছেন। এভাবেই মতন, শরাহ এবং হাশিয়ার মধ্যে সমন্বয় করে ইলম অর্জন করতে হয়।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

'রদ্দুল মুহতার'-এর বিন্যাস পদ্ধতিটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। যদিও প্রথম দেখায় এটি জটিল মনে হতে পারে, কিন্তু এই পদ্ধতির কারণেই একই পৃষ্ঠায় মতন, শরাহ এবং হাশিয়ার জ্ঞান একসাথে পাওয়া সম্ভব হয়। এই বিন্যাসটি ফিকহ শিক্ষার্থীদের মনোযোগ এবং গবেষণার গভীরতা বাড়াতে সাহায্য করে। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে রঙিন ছাপায় এই পার্থক্য আরও স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১৭: কিতাবটির সাথে তার পূর্ববর্তী হানাফি ফাতওয়ার কিতাবসমূহের সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ইবনে আবিদীন কীভাবে পূর্বসূরিদের প্রচেষ্টা থেকে উপকৃত হয়েছেন?

حلل طبيعة العلاقة بين كتاب رد المحتار وبين كتب الفتاوى الحنفية السابقة له، وضح كيف استفاد ابن عابدين من جهود من سبقه؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

কোনো ইলমি গবেষণাই শূন্য থেকে শুরু হয় না। প্রতিটি মহৎ কর্মই তার পূর্বসূরিদের প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। হানাফি ফিকহের চূড়ান্ত সংকলন 'রদ্দুল মুহতার' বা ফতোয়া শামীও এর ব্যতিক্রম নয়। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার এই কালজয়ী গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কয়েকশ বছরের হানাফি ফাতওয়ার কিতাবগুলোকে সামনে রেখেছিলেন। তবে তাদের সাথে তার কিতাবটির সম্পর্ক কেবল 'নকল' বা 'উদ্ধৃতি'র নয়, বরং এটি ছিল 'বিশ্লেষণ', 'পরিমার্জন' এবং 'পূর্ণতা দান'-এর সম্পর্ক।

পূর্ববর্তী ফাতওয়ার কিতাবসমূহের সাথে সম্পর্কের প্রকৃতি:

ইমাম ইবনে আবিদীনের 'রদ্দুল মুহতার'-এর সাথে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর (যেমন—ফাতওয়া কাজিখান, বাজ্জাজিয়া, তাতারখানিয়া, হিন্দিয়া, ফাতহুল কাদির ইত্যাদি) সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও বহুমাত্রিক।

১. বিচারক ও সমালোচকের সম্পর্ক (নাক্বিদ ও মুহাক্কিক):

ইবনে আবিদীন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর ওপর অন্ধভাবে নির্ভর করেননি। তিনি একজন বিচারকের মতো সেগুলোর রায় যাচাই করেছেন। অনেক সময় দেখা গেছে, 'ফাতওয়া বাজ্জাজিয়া' বা 'তাতারখানিয়া'তে কোনো একটি মাসআলায় দুর্বল মত উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে আবিদীন সেই ভুলটি ধরিয়ে দিয়েছেন এবং শক্তিশালী দলিল দিয়ে সঠিক মতটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই বলা যায়, তার কিতাবটি হলো পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর 'পরিশোধক' বা 'ফিল্টার'।

২. সমন্বয়কের সম্পর্ক (আল-জামিউ):

আগেকার যুগে মুফতিদের বিভিন্ন মাসআলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কিতাব খুঁজতে হতো। ইবনে আবিদীন তার কিতাবে পূর্ববর্তী প্রায় সব নির্ভরযোগ্য ফাতওয়া গ্রন্থের নির্যাস একত্রিত করেছেন। তিনি 'আল-বাহরুর রায়েক' থেকে গভীরতা নিয়েছেন, 'বাদায়েউস সানায়ে' থেকে বিন্যাস নিয়েছেন এবং 'ফাতওয়া হিন্দিয়া' থেকে ব্যাপকতা গ্রহণ করেছেন। তার কিতাবটি হলো পূর্ববর্তী সকল কিতাবের 'সংগমস্থল'।

ইবনে আবিদীন কীভাবে পূর্বসূরিদের প্রচেষ্টা থেকে উপকৃত হয়েছেন?

ইমাম ইবনে আবিদীন অকপটে তার পূর্বসূরিদের ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি কীভাবে উপকৃত হয়েছেন, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

- **দুর্লভ পাণ্ডুলিপির ব্যবহার:** দামেশকের সমৃদ্ধ লাইব্রেরিগুলোতে পূর্ববর্তী ইমামদের হাতে লেখা অনেক দুর্লভ পাণ্ডুলিপি (Manuscripts) সংরক্ষিত ছিল। ইবনে আবিদীন সেগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন। তিনি এমন অনেক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা অন্যদের কাছে ছিল না।

- **উদ্ধৃতি ও রেফারেন্স:** তিনি তার কিতাবের প্রতিটি পৃষ্ঠায় পূর্ববর্তী আলেমদের কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি প্রায়ই বলেন:

(كَمَا فِي الْبَحْرِ) - "যেমনটি 'আল-বাহর' কিতাবে আছে।"

(نَقَلَهُ فِي الْهِنْدِيَّةِ) - "এটি 'হিন্দিয়া'তে নকল করা হয়েছে।"

এর মাধ্যমে তিনি নিজের কথাকে পূর্বসূরিদের কথার মাধ্যমে শক্তিশালী করেছেন।

- **ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ:** তিনি নতুন করে ইমারত গড়েননি, বরং পূর্বসূরিদের গড়ে দেওয়া ভিত্তির ওপর তিনি সৌন্দর্যবর্ধন করেছেন। 'দুররুল মুখতার'-এর লেখক হাসকাফী (রহ.)-এর মূল টেক্সটকে তিনি ভিত্তি হিসেবে নিয়েছেন এবং তার ওপর নিজের গবেষণার প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন।

একটি উদাহরণ:

'দুররুল মুখতার'-এ হাসকাফী (রহ.) হয়তো বলেছেন, "এই আমলটি মাকরুহ।" ইবনে আবিদীন তখন পূর্ববর্তী কিতাব 'ফাতহুল কাদির' এবং 'নিহায়া' ঘেঁটে বের করেছেন যে, এটি কি 'মাকরুহে তাহরিমি' নাকি 'তানজিহি'? এরপর তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। অর্থাৎ, পূর্বসূরিদের ইঙ্গিতকে তিনি ব্যাখ্যায় রূপ দিয়েছেন।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

পরিশেষে বলা যায়, 'রদ্দুল মুহতার' হলো হানাফি ফিকহের এক হাজার বছরের যাত্রার চূড়ান্ত ফসল। ইমাম ইবনে আবিদীন পূর্বসূরিদের ইলমি বাগান থেকে ফুল সংগ্রহ করে এক তোড়া বানিয়েছেন, যার সুবাস কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে। তিনি পূর্ববর্তীদের কিতাবগুলোকে বাতিল করেননি, বরং সেগুলোকে যাচাই-বাছাই করে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছেন।

প্রশ্ন-১৮: কোন কারণগুলোর ফলে এ হাশিয়াটি ছাত্রদের ও ফকীহগণের মাঝে পূর্ণ শিরোনাম উল্লেখ না করে শুধু 'হাশিয়া ইবনে আবিদীন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে?

(استعرض الأسباب التي أدت إلى شهرة الحاشية بين طلبة العلم والفقهاء بلقب حاشية ابن عابدين دون ذكر العنوان الكامل)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

বইয়ের নামের চেয়ে লেখকের ব্যক্তিত্ব যখন অনেক বড় হয়ে ওঠে, তখন বইটি লেখকের নামেই পরিচিতি লাভ করে। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.)-এর কিতাবটির আসল নাম 'রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার'। নামটি অত্যন্ত অর্থবহ ও কাব্যিক। কিন্তু ইলমি সমাজে, মাদরাসায় এবং ফাতওয়া বিভাগে এটি 'হাশিয়া ইবনে আবিদীন' বা সংক্ষেপে 'শামী' নামেই বেশি পরিচিত। এই নামকরণের পরিবর্তনের পেছনে ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক কিছু কারণ রয়েছে।

'হাশিয়া ইবনে আবিদীন' নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণসমূহ:

এই কিতাবটি তার মূল নামের পরিবর্তে লেখকের নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার পেছনে প্রধান কারণগুলো নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. লেখকের বিশাল ব্যক্তিত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা:

ইমাম ইবনে আবিদীন তার যুগে এতটাই গ্রহণযোগ্য এবং আস্থাশীল ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন যে, মানুষ তার লেখা যেকোনো কিছুকেই অন্ধের মতো বিশ্বাস করত। যখনই কোনো মাসআলা নিয়ে আলোচনা হতো, মানুষ বলত, "ইবনে আবিদীন কী বলেছেন?" কিতাবের নামের চেয়ে লেখকের নাম নেওয়াটা বেশি আস্থার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার নাম শুনলেই মানুষ বুঝত যে, এখানে বিশুদ্ধ ফিকহ পাওয়া যাবে।

২. মূল নামের দীর্ঘতা ও উচ্চারণ জটিলতা:

কিতাবটির মূল নাম 'রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার শারহি তানভিরিল আবসার'—এটি বেশ দীর্ঘ এবং সাধারণ ছাত্র বা মানুষের জন্য মনে রাখা কঠিন। পক্ষান্তরে 'হাশিয়া ইবনে আবিদীন' বা 'ফতোয়া শামী' বলা অনেক সহজ ও শ্রুতিমধুর। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো সহজ শব্দ চয়ন করা। তাই মুখে মুখে এই সংক্ষিপ্ত নামটিই প্রচলিত হয়ে গেছে।

৩. 'হাশিয়া'র জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য:

'দুররুল মুখতার'-এর ওপর আরও অনেকে হাশিয়া বা টীকা লিখেছেন। যেমন—ইমাম তাহতাবী (রহ.)-এর হাশিয়া। কিন্তু ইবনে আবিদীনের হাশিয়াটি মানের দিক থেকে এতই উন্নত ছিল যে, অন্য সব হাশিয়া এর সামনে ম্লান হয়ে গেছে। ফলে যখনই কেউ 'হাশিয়া' শব্দ উচ্চারণ করে, তখন অটোমেটিক্যালি সবার মন

ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার দিকেই যায়। এটি 'আল-হাশিয়া' (The Hashiya) বা হাশিয়া জগতের সম্রাটে পরিণত হয়েছে।

৪. ফাতওয়া বিভাগের পরিভাষা (Istilah):

পরবর্তী যুগের মুফতিরা ফাতওয়া লেখার সময় রেফারেন্স দেওয়ার সুবিধার্থে সংক্ষেপায়ন করতেন। তারা ফাতওয়ার নিচে লিখতেন (شامي) বা (رد)। কালক্রমে এই সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স পদ্ধতিটিই কিতাবের নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ছাত্ররা উস্তাদকে জিজ্ঞেস করত, "হুজুর, শামীতে কী আছে?" এভাবেই নামটি বদলে গেছে।

৫. চূণান্ত সিদ্ধান্তকারী (Faysal) হিসেবে স্বীকৃতি:

যেহেতু এই কিতাবটি হানাফি মাযহাবের শেষ কথা, তাই এর পরিচয় লেখকের সাথেই মিশে গেছে। যেমন সহীহ আল-বুখারীর আসল নাম অনেক দীর্ঘ, কিন্তু ইমাম বুখারীর নামে তা পরিচিত। তেমনি ফিকহের ক্ষেত্রে ইবনে আবিদীনের কিতাবও তার নামে পরিচিতি পেয়েছে।

আরবি ইবারত:

আলেমদের মুখে একটি কথা প্রচলিত আছে:

(إِذَا أُطْلِقَ لَفْظُ "الْحَاشِيَةِ" فِي الْمَذْهَبِ، فَالْمُرَادُ بِهَا حَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ)

অর্থ: "মাযহাবে যখন সাধারণভাবে 'আল-হাশিয়া' শব্দটি বলা হয়, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় 'হাশিয়া ইবনে আবিদীন'।"

উপসংহার (আল-খাতিমা):

কিতাবটির এই প্রসিদ্ধি প্রমাণ করে যে, ইমাম ইবনে আবিদীন মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে কতখানি স্থান করে নিয়েছিলেন। নামের পরিবর্তন কোনো সাধারণ ঘটনা নয়; এটি লেখকের প্রতি উম্মাহর গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন। আজ 'ইবনে আবিদীন' নামটিই বিশুদ্ধ হানাফি ফিকহের সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন-১৯: এ হাশিয়াটি রচনার ক্ষেত্রে লেখকের লক্ষ্য কী ছিল? 'আদ-দুররুল মুখতার'-এর ব্যাখ্যার ওপর তিনি কী কী অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন?
ما هي أهداف المصنف من كتابة حاشيته هذه، وما هي الإضافات التي (قدمها على شرح الدر المختار؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

কোনো মহৎ কাজই লক্ষ্যহীনভাবে হয় না। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) যখন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম 'রদ্দুল মুহতার' রচনায় হাত দেন, তখন তার সামনে সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চেয়েছিলেন হানাফি মাযহাবকে এমনভাবে সাজাতে, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের আর কোনো বিভ্রান্তি না থাকে। তার এই হাশিয়াটি মূল কিতাব 'আদ-দুররুল মুখতার'-এর কেবল ব্যাখ্যা নয়, বরং এটি তার ওপর এক বিশাল সংযোজন ও পূর্ণতা দানকারী গ্রন্থ।

লেখকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (আহদাফুল মুসান্নিফ):

কিতাবটি রচনার পেছনে ইমাম ইবনে আবিদীনের প্রধান লক্ষ্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. অস্পষ্টতা দূরীকরণ: 'দুররুল মুখতার' কিতাবটি অত্যন্ত সংক্ষেপে লেখা ছিল। অনেক জায়গায় ধাঁধার মতো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল, যা সাধারণ ছাত্রদের জন্য বোঝা অসম্ভব ছিল। ইবনে আবিদীনের লক্ষ্য ছিল এই জটিল গিঁটগুলো খুলে দেওয়া এবং মাসআলাগুলোকে সহজবোধ্য করা।

২. ভুল সংশোধন (ইসলাহ): তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, হাসকাফী (রহ.) সংক্ষেপ করতে গিয়ে অনেক জায়গায় মাসআলার হুকুম পাল্টে ফেলেছেন বা দুর্বল মত উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবিদীন চাইলেন উম্মাহকে এই ভুলের হাত থেকে বাঁচাতে এবং বিশুদ্ধ মতটি পৌঁছে দিতে।

৩. চূড়ান্ত ফায়সালা প্রদান: মুফতিরা যাতে মতভেদের সাগরে হাবুডুবু না খান, সে জন্য তিনি একটি চূড়ান্ত মানদণ্ড বা 'স্ট্যান্ডার্ড' তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

'আদ-দুররুল মুখতার'-এর ওপর অতিরিক্ত সংযোজন (আল-ইজাফাত):

ইমাম ইবনে আবিদীন মূল কিতাবের ওপর যে মৌলিক সংযোজনগুলো করেছেন, তা কিতাবটিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে:

- ১. দলিলের অবতারণা (জিকরুদ দালাইল):

'দুররুল মুখতার'-এ সাধারণত মাসআলার দলিল (কুরআন, হাদিস বা কিয়াস) উল্লেখ ছিল না। ইবনে আবিদীন প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার সাথে তার দলিল সংযোজন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, হানাফি মাযহাবের এই কথাটি অমুক হাদিস বা অমুক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

- ২. কারণ দর্শানো (আত-তালিল):

তিনি শুধু হুকুম বলেননি, বরং হুকুমের পেছনের লজিক বা কারণ (Illat) ব্যাখ্যা করেছেন। কেন ইমাম আবু হানিফা এই মত দিয়েছেন এবং কেন ইমাম শাফেয়ী ভিন্ন মত দিয়েছেন—তার তুলনামূলক আলোচনা তিনি যোগ করেছেন।

- ৩. নতুন সমস্যার সমাধান (আন-নাওয়াজিল):

হাসকাফী (রহ.)-এর যুগের পর যেসব নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলোর সমাধান 'দুররুল মুখতার'-এ ছিল না। ইবনে আবিদীন তার হাশিয়াতে সেই যুগের নতুন মাসআলাগুলো (যেমন—তামাক সেবন, নতুন ধরণের ব্যবসায়িক লেনদেন) যুক্ত করেছেন।

- ৪. ফিকহী উসুলের প্রয়োগ:

তিনি মাসআলার সাথে সাথে ফিকহের মূলনীতি বা উসুলগুলোও উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন:

(...وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ)

অর্থ: "এই অধ্যায়ের মূলনীতি হলো..."

এর মাধ্যমে ছাত্ররা মাসআলা বের করার নিয়ম শিখতে পারে।

লেখকের নিজের বক্তব্য:

ইমাম ইবনে আবিদীন তার কিতাবের ভূমিকায় (খুতবা) লিখেছেন যে, তিনি এমন একটি কিতাব লিখতে চেয়েছেন যা:

(يَكُونُ كَافِيًا لِلْمُفْتِي عَنْ مُرَاجَعَةِ غَيْرِهِ)

অর্থ: "মুফতির জন্য যথেষ্ট হবে, যাতে তাকে অন্য কিতাব দেখার প্রয়োজন না হয়।"

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীন তার লক্ষ্য অর্জনে শতভাগ সফল হয়েছেন। তিনি 'দুররুল মুখতার'-এর কঙ্কালের ওপর মাংস ও চামড়া পরিয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। তার সংযোজনগুলো না থাকলে 'দুররুল মুখতার' হয়তো একটি দুর্বোধ্য কিতাব হিসেবেই থেকে যেত। তার হাশিয়ার মাধ্যমেই মূল কিতাবটি পূর্ণতা পেয়েছে।

প্রশ্ন-২০: তার কিতাবে আলোচিত ফিকহী অধ্যায়সমূহের প্রধান বিভাগগুলো বর্ণনা কর। আলোচনার গভীরতা এবং গবেষণার ব্যাপকতা স্পষ্টকরণসহ।
(ناقش الأقسام الرئيسية في تنظيم أبواب الفقه التي تناولها كتاب رد المحتار، مبينا عمق التناول وشمولية البحث)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

'রদ্দুল মুহতার' বা ফতোয়া শামী হলো ইসলামি আইনের এক বিশাল মহাসাগর। এই মহাসাগরে ডুব দিলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সমাধান পাওয়া যায়। ইমাম ইবনে আবিদীন তার এই কিতাবকে ফিকহের চিরাচরিত ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সাজিয়েছেন, কিন্তু তার আলোচনার গভীরতা ও ব্যাপকতা গতানুগতিক কিতাবগুলোর চেয়ে অনেক ভিন্ন ও সমৃদ্ধ। তিনি প্রতিটি অধ্যায়কে এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যেন তিনি সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ।

ফিকহী অধ্যায়সমূহের প্রধান বিভাগসমূহ (আল-আকসামুর রইসিয়্যা):

কিতাবটি প্রধানত চারটি মূল বিভাগে বিভক্ত, যা ইসলামি ফিকহের স্ট্যান্ডার্ড কাঠামো:

১. ইবাদত বা উপাসনা পর্ব (কিসমুল ইবাদাত):

- **শুরু ও বিষয়বস্তু:** কিতাবটি শুরু হয়েছে 'কিতাবুত তাহারাত' (পবিত্রতা) দিয়ে। এরপর সালাত, যাকাত, সাওম (রোজা) এবং হজ্জের আলোচনা এসেছে।
- **বিশেষত্ব:** সালাতের অধ্যায়ে তিনি নামাজের সময় নির্ণয়ের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ছায়ার জ্যামিতিক হিসাব নিয়েও আলোচনা করেছেন, যা তার বহুমুখী জ্ঞানের প্রমাণ দেয়।

২. **মুআমালাত বা লেনদেন পর্ব (কিসমুল মুআমালাত):**

- **বিষয়বস্তু:** ক্রয়-বিক্রয় (বাই), ভাড়া (ইজারা), বন্ধক (রহন্), এবং অংশীদারি কারবার (শিরকাত) ইত্যাদি।
- **বিশেষত্ব:** ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে তিনি বাজারের প্রথা (উরফ) এবং মানুষের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবসম্মত সমাধান দিয়েছেন।

৩. **মুনা কাহাত বা পারিবারিক আইন পর্ব (কিসমুল মুনাকাহাত):**

- **বিষয়বস্তু:** বিবাহ (নিকাহ), দুগ্ধপান (রদা), তালাক, খোরপোষ (নাফাকাহ) ইত্যাদি।
- **বিশেষত্ব:** এই অংশটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তিনি স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, তালাকের সূক্ষ্ম বিষয় এবং পারিবারিক জটিলতাগুলো অত্যন্ত দরদ দিয়ে এবং শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে সমাধান করেছেন।

৪. **জিনায়াত ও কাজা বা বিচার ও অপরাধ পর্ব:**

- **বিষয়বস্তু:** বিচার ব্যবস্থা, সাক্ষ্যদান, দণ্ডবিধি (হুদুদ ও কিসাস), এবং উত্তরাধিকার (ফারাইজ)।
- **বিশেষত্ব:** ফারাইজ বা মিরাস বন্টনের অংকগুলো তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমাধান করেছেন।

আলোচনার গভীরতা (উমকুত তানাওউল):

ইবনে আবিদীনের আলোচনার গভীরতা পরিমাপ করা কঠিন।

- **ভাষাগত বিশ্লেষণ:** কোনো শব্দের অর্থ নির্ণয়ে তিনি আরবি অভিধানের গভীরে প্রবেশ করেন।
- **মতভেদের বিশ্লেষণ:** তিনি শুধু ইমামদের মতভেদ উল্লেখ করেন না, বরং কেন মতভেদ হলো, কার দলিল কী, এবং কোন প্রেক্ষাপটে কে কী বলেছেন—তা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন।

- **উদাহরণের ব্যবহার:** তিনি জটিল নিয়মগুলো বোঝানোর জন্য প্রচুর উদাহরণ (আমসিলা) ব্যবহার করেছেন।

গবেষণার ব্যাপকতা (শুমুলিয়্যাতুল বাহাস):

তার গবেষণার পরিধি ছিল বিস্ময়কর।

- তিনি কেবল ফিকহ নিয়ে আলোচনা করেননি। প্রয়োজনে তিনি ডাক্তারি বিদ্যা (যেমন—মাসিকের রক্ত বা রোগের কারণে রোজা ভাঙা), গণিত (উত্তরাধিকার বন্টনে), এবং ভূগোল (কিবলা নির্ণয়ে) নিয়েও আলোচনা করেছেন।
- তিনি তার কিতাবে প্রায় ৫০০-এর বেশি সোর্স বা কিতাবের হাওয়ালা দিয়েছেন, যা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

'রদ্দুল মুহতার'-এর অধ্যায় বিন্যাস যদিও সাধারণ ফিকহী কিতাবের মতোই, কিন্তু এর ভেতরের মালমসলা সম্পূর্ণ অনন্য। প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি যে গভীরতা ও ব্যাপকতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা তাকে 'ইমামুল মুতাআখখিরিন' বা পরবর্তী যুগের ইমামের মর্যাদায় আসীন করেছে। এটি এমন এক কিতাব, যা পড়লে একজন ছাত্র শরীয়তের সামগ্রিক রূপ অনুধাবন করতে পারে।